61

বীরবলের দেরি হল কেন?

একদিন আকবর অপেক্ষা করছিলেন কখন তাঁর মন্ত্রী বীরবল প্রাসাদে আসবেন । বীরবলের আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, আর এতে আকবর বেশ রেগে গেলেন। বীরবল যখন এলেন, আকবর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এত দেরি হল কেন?"

"হে মহারাজ!" বীরবল বললেন। "আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, ঠিক তখনই আমার ছেলে কাঁদতে শুরু করল। তাকে শান্ত করার জন্য আমি কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছিলাম। সেই কারণেই আমার দেরি হয়েছে।"

"তুমি কি ঠাট্টা করছ?" আকবর বললেন। " একটা শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করতে কি সত্যিই এত বেশি সময় লাগে?" "সত্যিই তাই লাগে, মহারাজ!" বীরবল বললেন। "একটা শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।"

"কঠিন? আমি তো খুব সহজেই একটা শিশুর কান্না থামিয়ে দিতে পারি!" আকবর সগর্বে বলে উঠলেন।



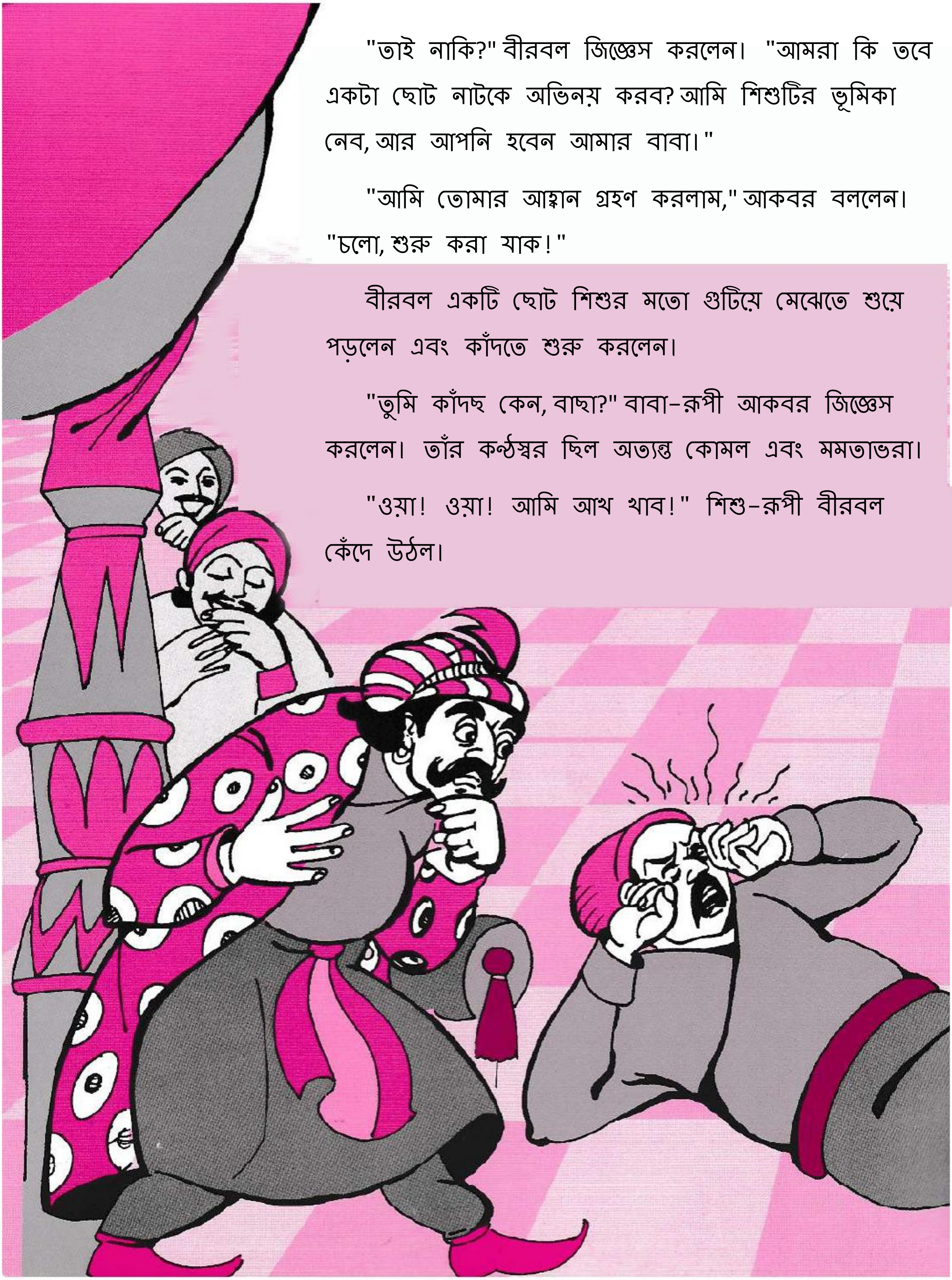
"তাই নাকি?" বীরবল জিজ্ঞেস করলেন। "আমরা কি তবে একটা ছোট নাটকে অভিনয় করব? আমি শিশুটির ভূমিকা নেব, আর আপনি হবেন আমার বাবা।"

"আমি তোমার আহ্বান গ্রহণ করলাম," আকবর বললেন। "চলো, শুরু করা যাক!"

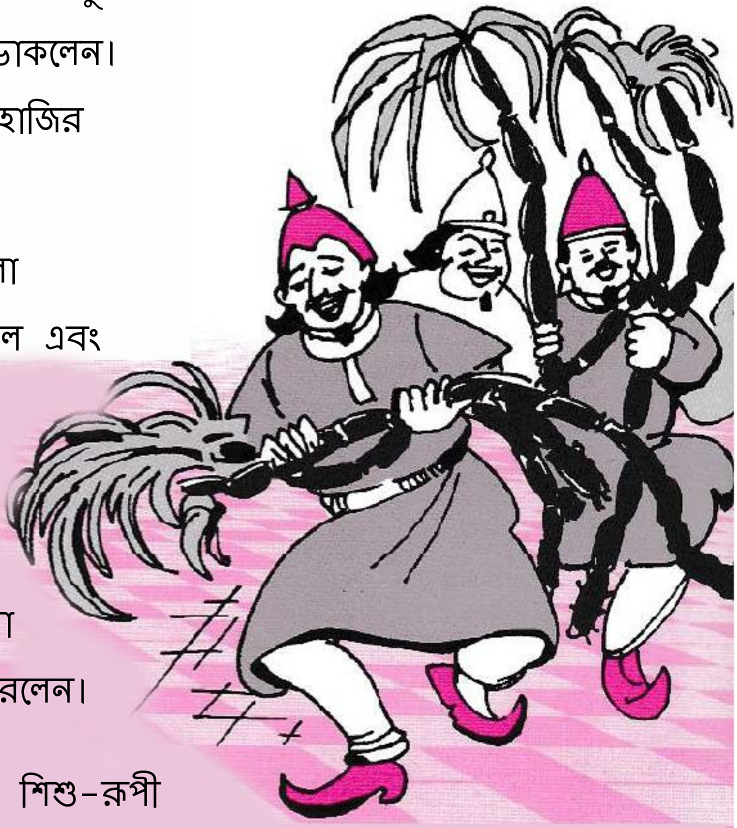
বীরবল একটি ছোট শিশুর মতো গুটিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন।

"তুমি কাঁদছ কেন, বাছা?" বাবা-রূপী আকবর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর কন্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত কোমল এবং মমতাভরা।

"ওয়া! ওয়া! আমি আখ খাব!" শিশু-রূপী বীরবল কেঁদে উঠল।



"কেঁদো না!" বাবা-রূপী আকবর বললেন। "তুমি অবশ্যই আখ পাবে!" তিনি তাঁর ভৃত্যদের ডাকলেন। এক মিনিটের মধ্যেই তারা কিছু আখ নিয়ে হাজির হল।



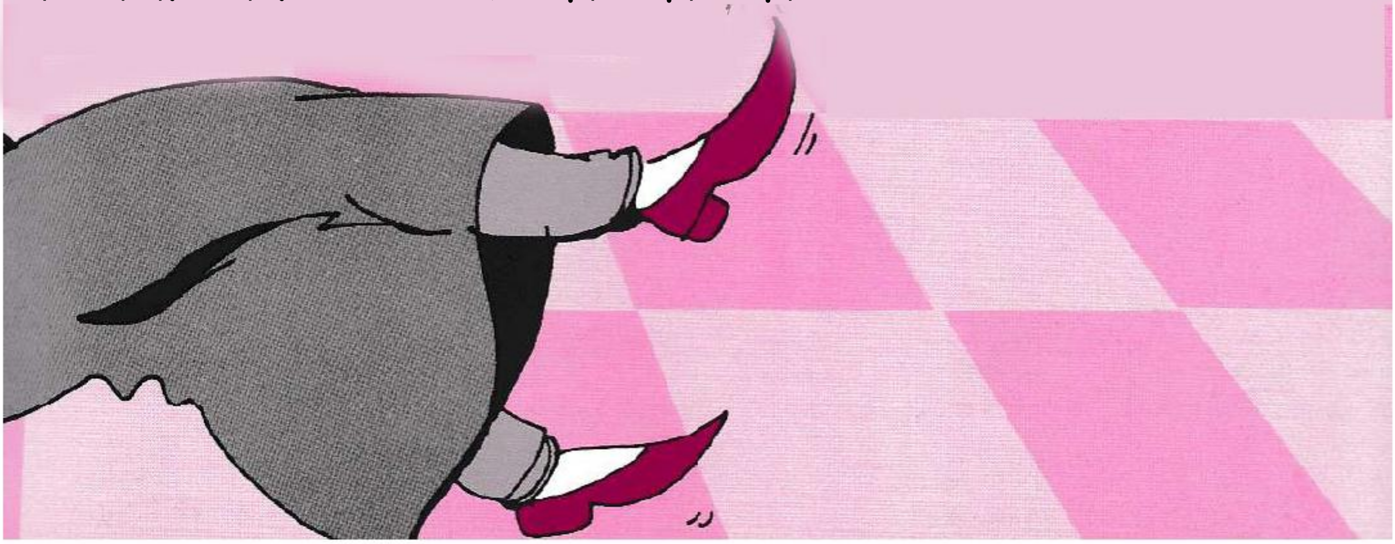
শিশু-রূপী বীরবল যখন আখের ছড়াগুলো দেখতে পেল, তখন সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল এবং মেঝেতে আছাড় মারতে লাগল। তার কান্নার তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। "ওয়া! ওয়া!" সেই শব্দ ছিল অসহনীয়!

"এই তো আখ এনেছি, বাছা। তুমি এখনো কাঁদছ কেন?" বাবা-রূপী আকবর জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি আখের ছোট ছোট টুকরো চাই!" শিশু-রূপী বীরবল চিৎকার করে কাঁদল। "ওয়া, ওয়া!"

"এইটুকুই তো?" বাবা-রূপী আকবর জিজ্ঞেস করলেন। "আমি এখনই এগুলো কাটিয়ে টুকরো করে দিচ্ছি!"

আকবরের ভৃত্যরা আখগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ফেলল। তারা সেগুলো শিশুটির সামনে এগিয়ে দিল। কিন্তু শিশু-রূপী বীরবল আখের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে এদিক-সেদিক ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে মেঝেতে সজোরে হাত-পা আছাড় মারতে লাগল। সে আরও জোরে কাঁদতে শুরু করল। "ওয়া! ওয়া! ওয়া!"



বাবা-রূপী আকবর তখন হতবাক হয়ে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কাঁদছ কেন? তুমি তো সেই আখের টুকরোগুলোই পেয়েছ, যা তুমি চেয়েছিলে!"

"ওই টুকরোগুলো আবার জোড়া লাগিয়ে দাও!" শিশু বীরবল চিৎকার করে উঠল। "আমি আখের একটা আস্ত ছড়া চাই!"

এ পর্যায়ে এসে আকবর ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। "আমি কীভাবে আখের টুকরোগুলো আবার জোড়া লাগাব? ছোট ছোট টুকরো দিয়ে আখের একটা আস্ত ছড়া তৈরি করা তো সম্ভব নয়!"

আর এভাবেই বীরবলের দাবির সত্যতা তাঁর কাছে উন্মোচিত হল। তিনি বললেন, "তুমিই ঠিক বলেছ, বন্ধু! একটা শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করা মোটেও সহজ কাজ নয়।"

বীরবল হাসলেন। নিজের পোশাক থেকে ধুলো ঝেড়ে তিনি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। "আজ সকালে আমার ছেলেও ঠিক এমনই আচরণ করছিল। আমি তো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না কী করব! সত্যি বলতে, আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, তখনও সে কাঁদছিল।"

আকবর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। "এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে যাও এবং তোমার সন্তানের খোঁজ নাও!" তিনি বললেন।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

62 নন্দরিয়ার আত্মত্যাগ

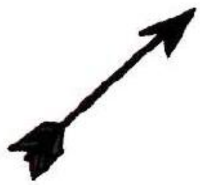


চোখ বন্ধ কর। তোমার মানসপটে ভেসে উঠুক একটি দীর্ঘ, খরস্রোতা নদী। এটি গঙ্গা নদী। দেখ! নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল আমগাছ। একদল বানর সেই গাছের ফল পরম তৃপ্তিতে ভক্ষণ করছে। তারা কতই না ভাগ্যবান! এমন এক স্থানে তাদের বাস, যেখানে প্রতিটি ভোজনই ইন্দ্রিয়গুলোর জন্য এক পরম আনন্দের উৎস!



তবুও, সেই দলের সর্দার নন্দরিয়া বেশ চিন্তিত। আমগাছটির একটি ডাল নদীর ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে। যদি কোনো আম জলে পড়ে যায়, তবে কী হবে?





নন্দরিয়া তার দলের সবাইকে একত্রিত করে ডাক দেয়। "দেখ, এই ডালটি কীভাবে নদীর ওপর ঝুঁকে আছে। আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ডাল থেকে একটি আমও জলে না পড়ে।

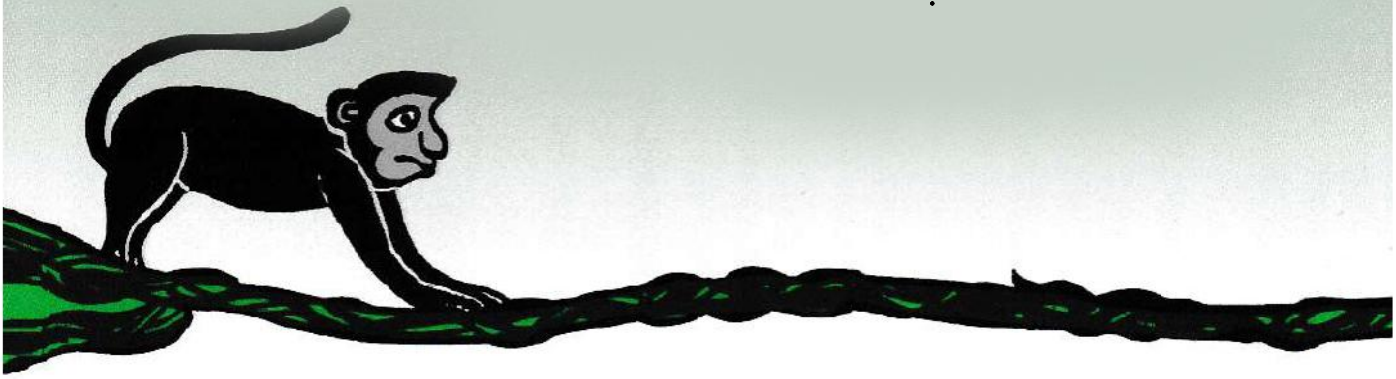
"যদি কোনো আম জলে পড়ে যায়, তবে তা হয়তো মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। মানুষ তখন সেই গাছটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, যে গাছে এমন সুস্বাদু ফল ফলে। তারা এখানে চলে আসবে, আমাদের দেখতে পাবে এবং তাড়িয়ে দেবে।"



"এই ডালটির ওপর কড়া নজর রেখো! ফল পেকে ওঠার সাথে সাথেই তা পেড়ে ফেলবে!" নন্দরিয়া নির্দেশ দেয়। "কখনোই আমগুলোকে নিচে পড়তে দেবে না!"

কিন্তু একটি আম ঠিকই পড়ে যায়—সবার অলক্ষ্যে, সরাসরি নদীর জলে। স্রোতের ধাক্কায়, জলের তোড়ে বারবার ডুবতে-ভাসতে আর এদিক-সেদিক দুলতে দুলতে আমটি ভেসে চলে। কোনো না কোনোভাবে সেটি গিয়ে পৌঁছায় রাজার হাতে। "এই আমটি কোথা থেকে এল?"—আমটির স্বাদ ও গন্ধে মুগ্ধ হয়ে রাজা বিস্ময়ের সাথে ভাবেন। সেই আমগাছটি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন।

সেখানে পৌঁছে রাজা গাছটির বিশাল আকৃতি এবং তাতে ফলের প্রাচুর্য দেখে অভিভূত হয়ে যান। তবে ততক্ষণে রাত ঘনিয়ে এসেছে। তাই তিনি সেখানেই শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দেন: "তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র একপাশে সরিয়ে রাখো এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। আমরা সকালে উঠে আমগুলো পেড়ে নেব।"



রাতটি ছিল ঘোর অন্ধকার। মেঘের এক পুরু চাদরে আকাশটা ঢাকা। চাঁদও অনেক আগেই অস্তাচলে পাড়ি দিয়েছে । নন্দরিয়া এবং তার দলের বানরেরা ঘুমন্ত সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় এবং গাছে উঠে পড়ে। তারা পরম তৃপ্তিতে আম ভক্ষণ করতে থাকে।

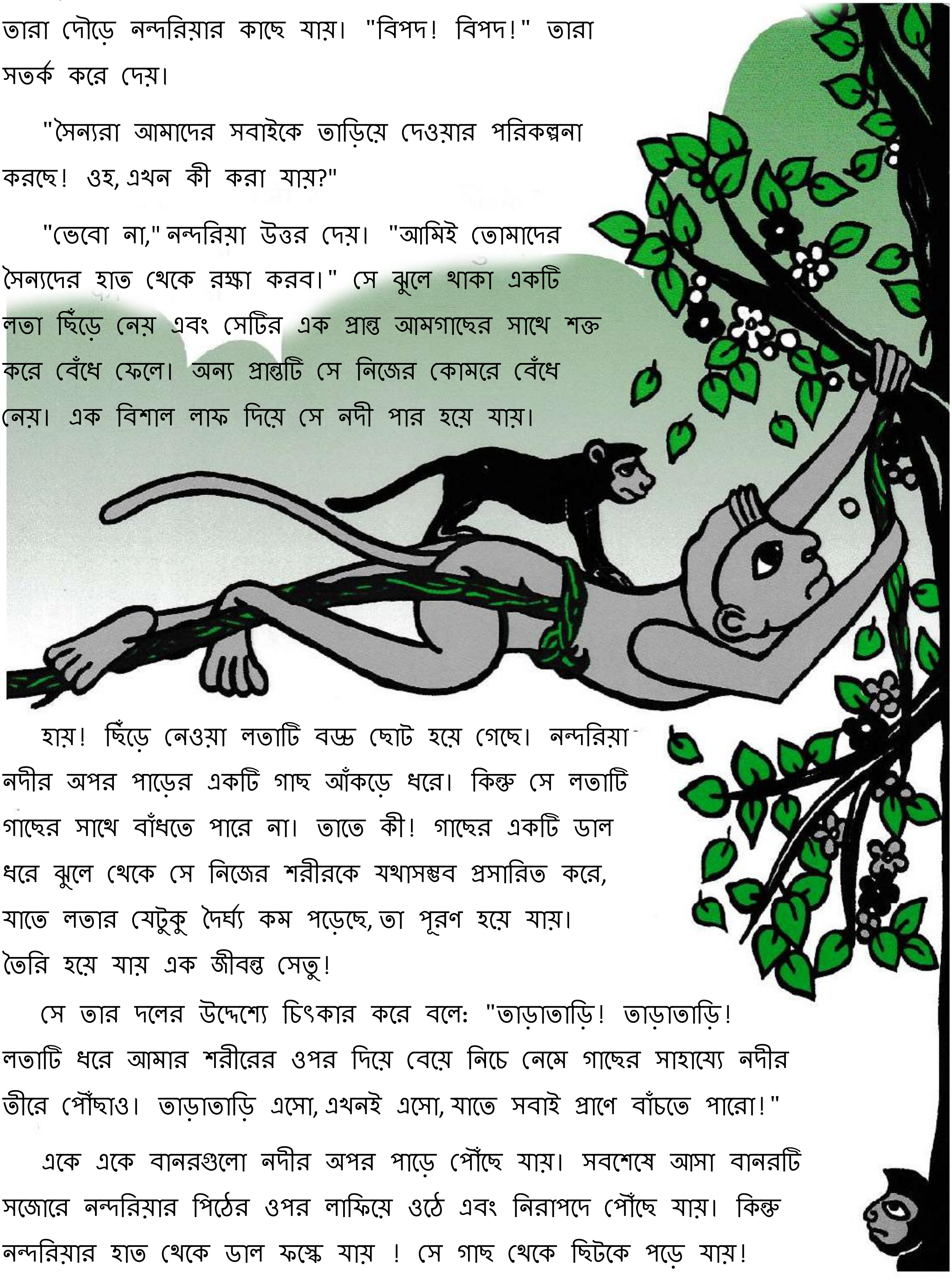
কিন্তু আম খাওয়ার আনন্দে মগ্ন হয়ে তারা নিচে ঘুমন্ত সৈন্যদলের কথা বেমালুম ভুলে যায়। তাদের নীরবতা প্রথমে ফিসফিসানিতে পরিণত হয়, আর সেই ফিসফিসানি একসময় পরিণত হয় উচ্চকণ্ঠের কলরবে। রাজার প্রহরীরা রাজাকে জাগিয়ে তোলে। "মহারাজ, গাছটি তো বানরে ভরে গেছে!" তারা রাজাকে জানায়। "এখন আমাদের কী করণীয়?"

"সৈন্যদের ঘুমাতে দাও," রাজা উত্তর দেন। "ভোরের আলো ফুটলেই আমরা বানরগুলোকে তাড়িয়ে দেব।"

দুটি বানর রাজার পরিকল্পনা আড়াল থেকে শুনে ফেলে। তারা দৌড়ে নন্দরিয়ার কাছে যায়। "বিপদ! বিপদ!" তারা সতর্ক করে দেয়।

"সৈন্যরা আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে! ওহ, এখন কী করা যায়?"

"ভেবো না," নন্দরিয়া উত্তর দেয়। "আমিই তোমাদের সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করব।" সে ঝুলে থাকা একটি লতা ছিঁড়ে নেয় এবং সেটির এক প্রান্ত আমগাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। অন্য প্রান্তটি সে নিজের কোমরে বেঁধে নেয়। এক বিশাল লাফ দিয়ে সে নদী পার হয়ে যায়।



হায়! ছিঁড়ে নেওয়া লতাটি বড্ড ছোট হয়ে গেছে। নন্দরিয়া নদীর অপর পাড়ের একটি গাছ আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সে লতাটি গাছের সাথে বাঁধতে পারে না। তাতে কী! গাছের একটি ডাল ধরে ঝুলে থেকে সে নিজের শরীরকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে, যাতে লতার যেটুকু দৈর্ঘ্য কম পড়েছে, তা পূরণ হয়ে যায়। তৈরি হয়ে যায় এক জীবন্ত সেতু!

সে তার দলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে: "তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! লতাটি ধরে আমার শরীরের ওপর দিয়ে বেয়ে নিচে নেমে গাছের সাহায্যে নদীর তীরে পৌঁছাও। তাড়াতাড়ি এসো, এখনই এসো, যাতে সবাই প্রাণে বাঁচতে পারো!"

একে একে বানরগুলো নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে যায়। সবশেষে আসা বানরটি সজোরে নন্দরিয়ার পিঠের ওপর লাফিয়ে ওঠে এবং নিরাপদে পৌঁছে যায়। কিন্তু নন্দরিয়ার হাত থেকে ডাল ফস্কে যায় ! সে গাছ থেকে ছিটকে পড়ে যায়! নিচে, একদম নিচে—নদীর তীরে গিয়ে সে আছড়ে পড়ে।

রাজা বানরদের এই পলায়নপর্বের পুরোটাই লক্ষ্য করছিলেন। এখন তিনি দৌড়ে নন্দরিয়ার কাছে ছুটে যান। কিন্তু নন্দরিয়াকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিল না। তার শরীর থেকে প্রাণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল । রাজা বললেন, "নিজের জীবনের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে তুমি তোমার প্রজাদের রক্ষা করেছ। এমন আত্মত্যাগ আমি জীবনে কখনো দেখিনি।"

কিন্তু নন্দরিয়া উত্তর দিল, "মহারাজ, একজন রাজার কর্তব্য হল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে প্রজাদের কল্যাণকে ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। আমি যা করেছি, তা কেবল আমার কর্তব্য পালন মাত্র।"

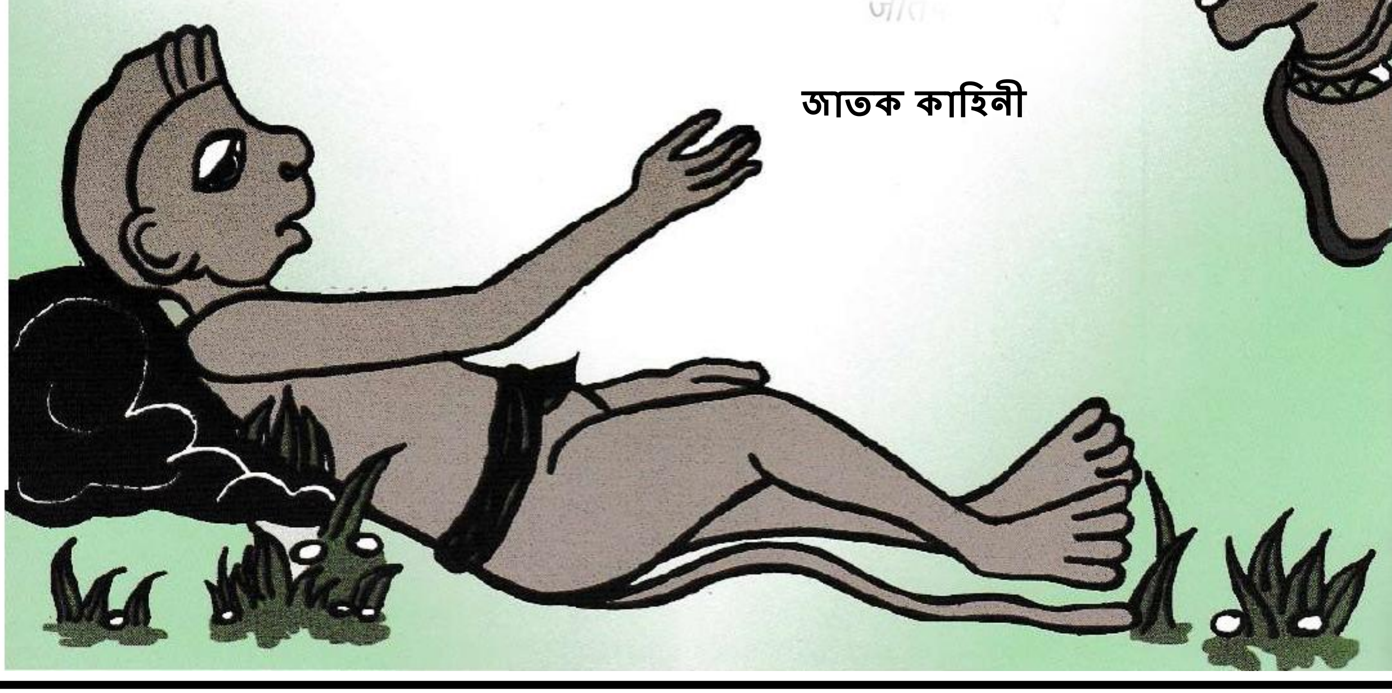
"আমি তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই, হে বানররাজ," শোকাহত কণ্ঠে রাজা উত্তর দিলেন। "তোমার শেষ ইচ্ছাটি আমাকে জানাও, যাতে আমি তা পূর্ণ করতে পারি।"

"আমার প্রজারা যেন মানুষের খেয়ালখুশির অধীন না হয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে—এটাই আমার শেষ ইচ্ছা," মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে নন্দরিয়া বলে উঠল।

আর ঠিক সেভাবেই রাজা আদেশ জারি করলেন। "আজ থেকে এই গাছটি সম্পূর্ণভাবে নন্দরিয়ার প্রজাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; মানুষ যেন চিরকাল এই গাছের ফল পাড়া থেকে বিরত থাকে," তিনি ঘোষণা করলেন। এরপর তিনি এবং তাঁর সেনাবাহিনী সেই স্থান ত্যাগ করলেন।



জাতক কাহিনী



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

তেনালি রামন ও জাদুকর

একদিন বিজয়নগরে এক জাদুকর এলেন। তিনি রাজার রাজপ্রাসাদে অনেক চমৎকার জাদুর খেলা প্রদর্শন করলেন। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা দেখল। সময় যে কীভাবে কেটে গেল, তা তারা টেরই পেল না।



জাদুকর মাটিতে একটি খালি ঝুড়ি রাখলেন। তিনি সেটিকে উল্টে দিলেন। তারপর সেটি উপরে তুলে ধরলেন। ফুস! অমনি সেখানে একটি আমের চারা গাছ দেখা গেল!

তিনি একটি টেবিলের ওপর পাখির একটি খালি খাঁচা রাখলেন। তিনি খাঁচার দরজাটি খুলে দিলেন। ভেতর থেকে একটি পায়রা উড়ে বেরিয়ে এল! সবাই তুমুল করতালি দিয়ে উঠল!

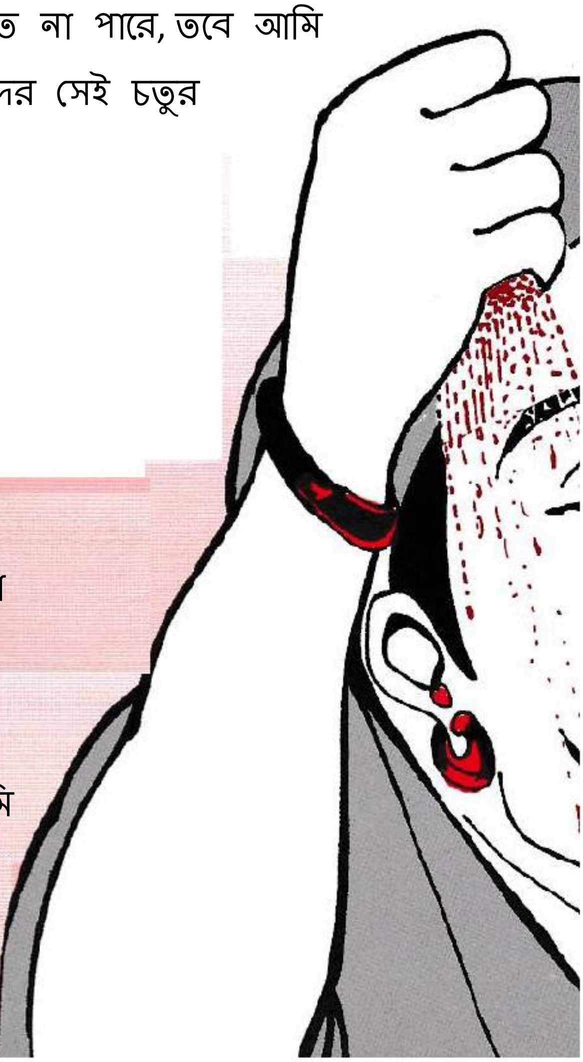


জাদুকর কয়েকটি ছোট পাথর কুড়িয়ে নিলেন। জাদুর ছোঁয়ায়—চমক! সেগুলো সোনার মুদ্রায় পরিণত হলো! এরপর তিনি সজোরে চোখ বন্ধ করলেন। রাজার আঙুল থেকে একটি আংটি উড়ে এল। সেটি সোজা জাদুকরের কাছে চলে এল!

দর্শকরা জাদুর প্রদর্শনী দারুণ উপভোগ করছিল! এমনকি রাজা নিজেও জাদুকরের প্রতিভার প্রশংসা করলেন। তিনি জাদুকরকে উপহার ও পুরস্কারে ঠাসা একটি রুপার থালা প্রদান করলেন।

কিন্তু জাদুকর পুরস্কারের চেয়েও আরও বেশি কিছু চাইছিলেন। তিনি একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে বিজয়নগরে এসেছিলেন। তিনি বললেন, "এখানে কি এমন কেউ আছেন, যিনি জাদুকৌশলে আমাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন? যদি কেউ থাকেন, তবে আমি আমার পাওয়া এই সমস্ত উপহার-পুরস্কার তাকেই দিয়ে দেব!" কেউ এগিয়ে এলেন না। এতই দক্ষ একজন জাদুকরকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারুরই ছিল না।

তখন জাদুকর বললেন, "যদি কেউ আমাকে হারাতে না পারে, তবে আমি যখন বিজয়নগর ত্যাগ করে চলে যাব, তখন আপনাদের সেই চতুর মন্ত্রী—তেনালি রামন—অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবেন!"



তেনালি রামনও অন্যদের মতোই জাদুকরের প্রদর্শনী উপভোগ করছিলেন। নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে তিনি চমকে উঠলেন। তিনি রাজার দিকে তাকালেন; রাজার সেই সৌম্য মুখমণ্ডলটি তখন গভীর দুশ্চিন্তার রেখায় আচ্ছন্ন। তেনালি মনে মনে ভাবলেন, "এই জাদুকরকে বুদ্ধির জোরে হারিয়ে দেওয়ার কোনো একটা উপায় আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে তিনি বললেন, "হে মহান জাদুকর! আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম! আমি এমন একটি জাদুর কৌশল প্রদর্শন করব, যার কোনো প্রতিযোগী কৌশল আপনি দেখাতে পারবেন না।"

"আমার জাদুর কৌশলটি প্রদর্শন করার পর, আপনাকেও ঠিক একই কৌশলটি প্রদর্শন করতে হবে। তবে আমি আমার কৌশলটি প্রদর্শন করব চোখ বন্ধ রেখে; আর আপনাকে সেটি করতে হবে চোখ খোলা রেখে।" "আপনি কি রাজি?"

জাদুকরটি ইতস্তত করলেন। তেনালি রামন তো ভীষণ চতুর! নিশ্চয়ই তিনি কোনো চমক দেখানোর ফন্দি আঁটছেন। আর তবুও... চোখ বন্ধ করে কোনো জাদুর কৌশল দেখানোর চেয়ে চোখ খোলা রেখে তা করা কি খুব বেশি কঠিন হতে পারে? অবশেষে তিনি বললেন, "এ তো বেশ সহজ মনে হচ্ছে! আমি রাজি!"

তেনালি রামন একটি ফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দু-হাতে কিছুটা মাটি তুলে নিলেন। তারপর তিনি তাঁর চোখ দুটি শক্ত করে বন্ধ করলেন। ধীরে ও সতর্কতার সাথে, তিনি সেই মাটি তাঁর চোখের পাতার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি একটি কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ দুটি ভালো করে মুছে নিলেন। তিনি জাদুকরের দিকে ফিরলেন। "এবার আপনি চোখ খোলা রেখে এই কৌশলটি করে দেখান তো!" তিনি বললেন।



জাদুকরের মনে যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তা মুহূর্তেই নড়ে উঠল। তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও সরল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তিনি তাঁর মাথা নত করলেন। তারপর তিনি বিজয়নগর ত্যাগ করলেন—আর কখনোই সেখানে ফিরে আসেননি।

"হুররে!" সমস্বরে বলে উঠল জনতা। "তেনালি রামন আবারও জয়ী হয়েছেন!"

"তুমি আমাদের সম্মান রক্ষা করেছ!" বললেন রাজা। আর তিনি তেনালি রামনকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করলেন।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

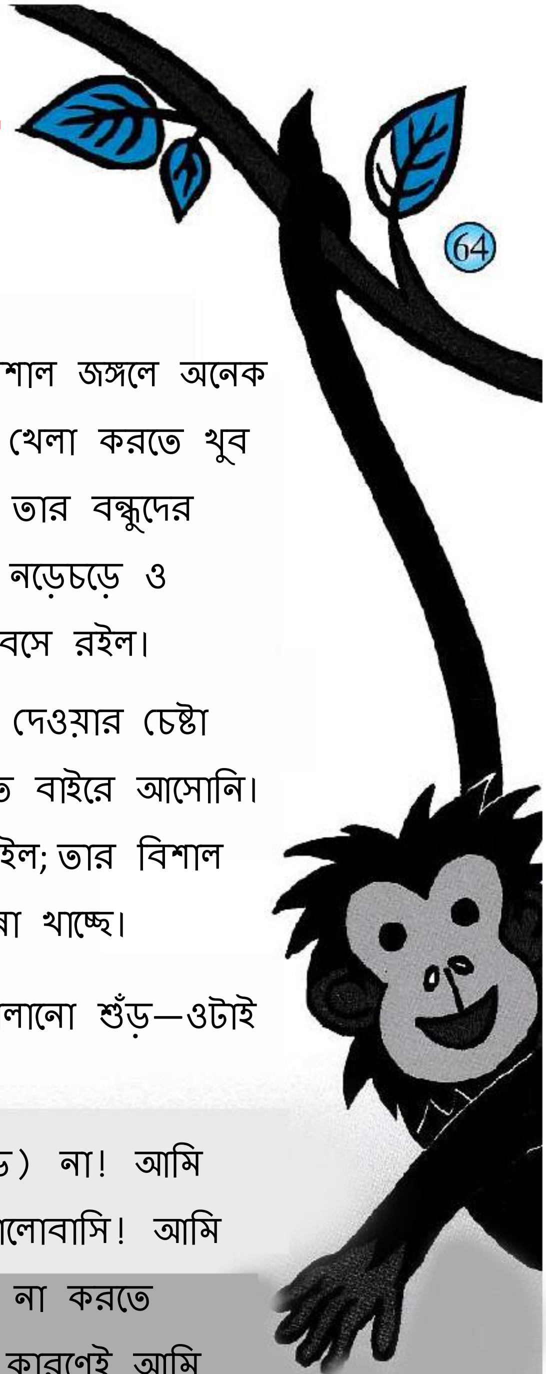
P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy





আপ্পু ও তার বন্ধুরা

ছোট্ট হাতি আপ্পুর এই বিশাল জঙ্গলে অনেক বন্ধু আছে। সে তাদের সাথে খেলা করতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু আজ আপ্পু তার বন্ধুদের সাথে যোগ দিল না। সে না নড়েচড়ে ও কোনো কথা না বলে একাই বসে রইল।

আপ্পুর বন্ধুরা তাকে দেখতে এল। তারা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। মাছরাঙা: হ্যালো, আপ্পু। তুমি আমাদের সাথে খেলতে বাইরে আসোনি। আমাকে কি বলবে কেন আসোনি? আপ্পু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তার বিশাল মাথাটা নিচু হয়ে আছে, আর তার শুঁড়টা মাটির সাথে ঘষা খাচ্ছে।

মাছরাঙা: আমি জানি! সেটা হলো তোমার লম্বা, ঝোলানো শুঁড়—ওটাই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না?



আপ্পু: (মাথা নেড়ে) না! আমি আমার শুঁড়কে খুব ভালোবাসি! আমি ওটা দিয়ে কত কাজই না করতে পারি! আমার শুঁড়ের কারণেই আমি একজন চমৎকার কর্মী!

বাঁদর দুলতে দুলতে সেখানে এল।

বাঁদর: আমি জানি! সেটা হল তোমার ছোট্ট, পুঁচকে লেজ—ওটাই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? তুমি তো আমার মতো গাছে গাছে দুলতে পারো না।

আপ্পু: (পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে) আমার লেজটা ছোট হতে পারে, কিন্তু ওটা আমার কাজে লাগে! আমি তোমার মতো গাছে গাছে দুলতে চাই না!

হরিণ: আমি জানি! তোমার সমস্যা হলো তোমার মোটা পাগুলো—ওগুলোই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? তোমার পাগুলো তো আমার পায়ের মতো ছিমছাম আর সরু নয়।



আপ্পু: (চোখ উল্টে) না, না! আমি আমার পাগুলোকে ভালোবাসি। ওগুলো খুব শক্তিশালী আর রাজকীয়। ওগুলো যেমন আছে, তেমনই আমি পছন্দ করি! হুম্ফ!!

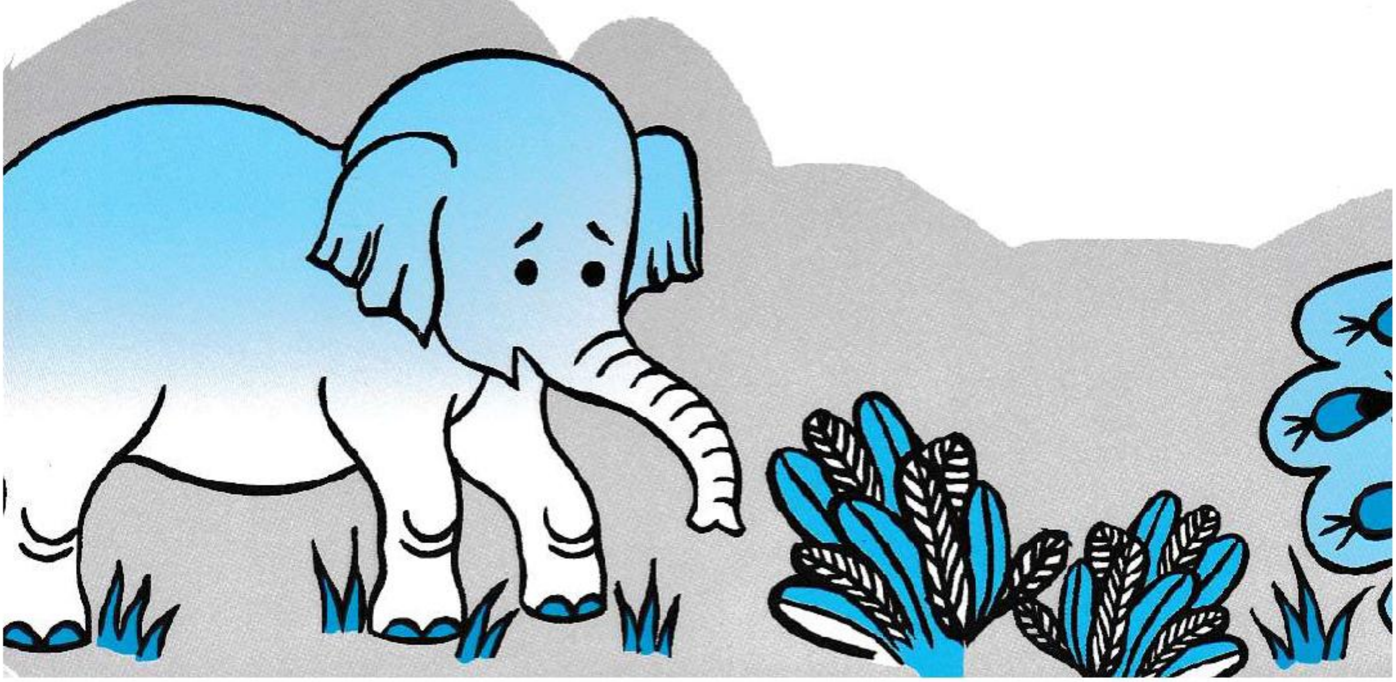
এবার ময়ূরটা উড়ে এল।

ময়ূর: আমি জানি! সেটা হলো তোমার ফ্যাকাসে ধূসর রঙ—ওটাই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? তুমি হয়তো আমার সুন্দর পালকের মতো উজ্জ্বল সবুজ আর নীল রঙ পেতে চাইছ।

আপ্পু: (জোরে হেসে উঠে) একদমই না! আমি আমার এই সাদামাটা ধূসর রঙকেই ভালোবাসি।

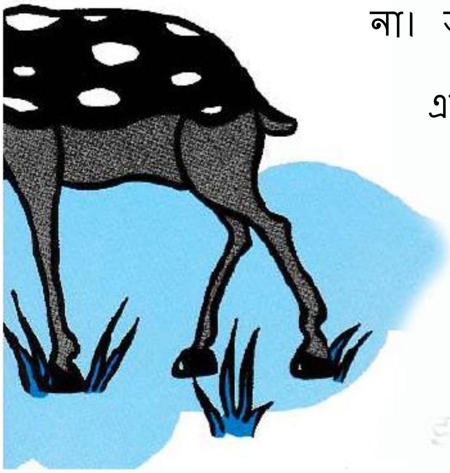
রঙটা হয়তো ফ্যাকাসে, কিন্তু শিকারিদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে এটা আমাকে সাহায্য করে।

বাঁদরটা তখন লাফালাফি শুরু করে দিল।



বাঁদর: তাহলে তোমার সমস্যা যা-ই হোক না কেন, ওসব ভুলে যাও! চলো আমাদের সাথে!

আমরা এখন আখ খেতে যাচ্ছি।



আপ্পু: (মুখ গোমড়া করে) না! আমি আর কিছুই খেতে চাই না। আমি বড্ড বেশি মোটা হয়ে গেছি!

এবার অপু কাঁদতে শুরু করল।

ভালুক: এই বুঝি তোমার সমস্যা? কিন্তু তুমি তো মোটেও মোটা নও! তোমার শরীরটা তো বিশাল আর শক্তিশালী—ঠিক যেমনটা একটা হাতির হওয়া উচিত!

অপু: (হাসার চেষ্টা করতে করতে) মোটা নই? শোনো তবে। টানা তিন দিন ধরে আমি কিছুই খাইনি! এক গ্রাসও না! অথচ আমার ওজন একরত্তিও কমেনি!

হঠাৎই তারা একটা আর্তনাদ শুনতে পেল। "আমাকে বাঁচাও! কেউ একজন আমাকে সাহায্য করো!" পশুরা অপুকে ছেড়ে সেই আওয়াজের দিকে ছুটে গেল। ওই তো সেখানে! একটা শিয়াল কাঁদছে! একটা পড়ে-যাওয়া গাছের নিচে সে আটকা পড়ে আছে!

শিয়াল: আউ... আউ... উফ! লাগছে!! দয়া করে আমাকে বাঁচাও!

বাঁদর, ময়ূর আর হরিণ মিলে গাছটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তারা গাছের একটা ডালও নড়াতে পারল না!



সবাই: বেচারা শিয়াল! যেভাবেই হোক, আমাদের ওকে উদ্ধার করতেই হবে!

তারা অপুর কাছে ছুটে গেল এবং তাকে শিয়াল যেখানে আটকা পড়েছিল, সেখানে নিয়ে এল।

অপু: (নিজের শুঁড় দোলাতে দোলাতে) তোমরা সবাই সরে দাঁড়াও! এবার আমাকে চেষ্টা করতে দাও!

অপু তার শুঁড় দিয়ে নিমেষের মধ্যে গাছটাকে টেনে সরিয়ে দিল। শোঁওওও!

সবাই: হুররে! দারুণ হয়েছে! দেখলে তো অপু! একমাত্র তুমিই শিয়ালটাকে বাঁচাতে পারলে!

বাঁদর: এবার বুঝতে পারছ তো? তোমার বিশাল শরীরের কারণেই তুমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী!

অপু: (হাঁফ ছেড়ে) হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমিই সেই প্রাণী! আর এখন চলো, খেতে যাই: এত খাটাখাটনির পর আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে!

পারো আনন্দের একটি গল্প অবলম্বনে রচিত



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

65

আমাদের নেতা



একদা এক গভীর, অন্ধকার অরণ্য ছিল। সেখানে অনেক প্রাণী মিলেমিশে বাস করত। তাদের নেতা ছিল একটি সিংহ।

সব প্রাণীই সেই সিংহকে শ্রদ্ধা করত। যখনই তাদের কোনো সমস্যা দেখা দিত, তারা তার পরামর্শ চাইতে ছুটে আসত। সিংহটি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করত এবং প্রাণীরাও সানন্দে তার সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিত।

একদিন একদল শিকারি সেই অরণ্যে প্রবেশ করল। প্রাণীরা সবাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল! তারা ছুটে সিংহের কাছে গেল। "শিকারিরা আসছে! শিকারিরা আসছে!"—তারা সিংহকে জানাল।

সিংহটি তার গুহা থেকে বেরিয়ে এল এবং বলল, "তোমরা এখানেই থাকো। শান্ত হও। আমি শিকারিদের সাথে লড়াই করব এবং তাদের তাড়িয়ে দেব।"

সিংহটি দ্রুত শিকারিদের খুঁজে পেল। সে এক বিকট গর্জন করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিকারিদের কেউ কেউ ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু কয়েকজন লড়াই করার জন্য সেখানেই থেকে গেল।



তারা সিংহটিকে আহত করে ফেলল! কিন্তু সিংহটি দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। অবশেষে, সে শিকারিদের পরাজিত করল। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অরণ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সব প্রাণীই সিংহকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ছুটে এল। কিন্তু এ কী! সিংহটি যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছিল। তার পাগুলো ভেঙে গিয়েছিল! প্রাণীরা তাকে সাহায্য করে তার গুহায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সিংহটি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য তারা অত্যন্ত উৎকন্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু সিংহের পাগুলো আর সারল না। তাই প্রাণীরা তার জন্য একটি হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করল। সিংহটি সেই চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে পুরো অরণ্য ঘুরে দেখত। প্রাণীরা প্রতিদিন তার জন্য খাবার নিয়ে আসত এবং তার সেবাযত্ন করত।

কিছুদিন পর, প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ এই কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল । তারা সিংহটির জন্য খাবার আনা বন্ধ করে দিল। এমনকি তারা তার কাছে কোনো সাহায্য বা পরামর্শ চাওয়াও বন্ধ করে দিল।



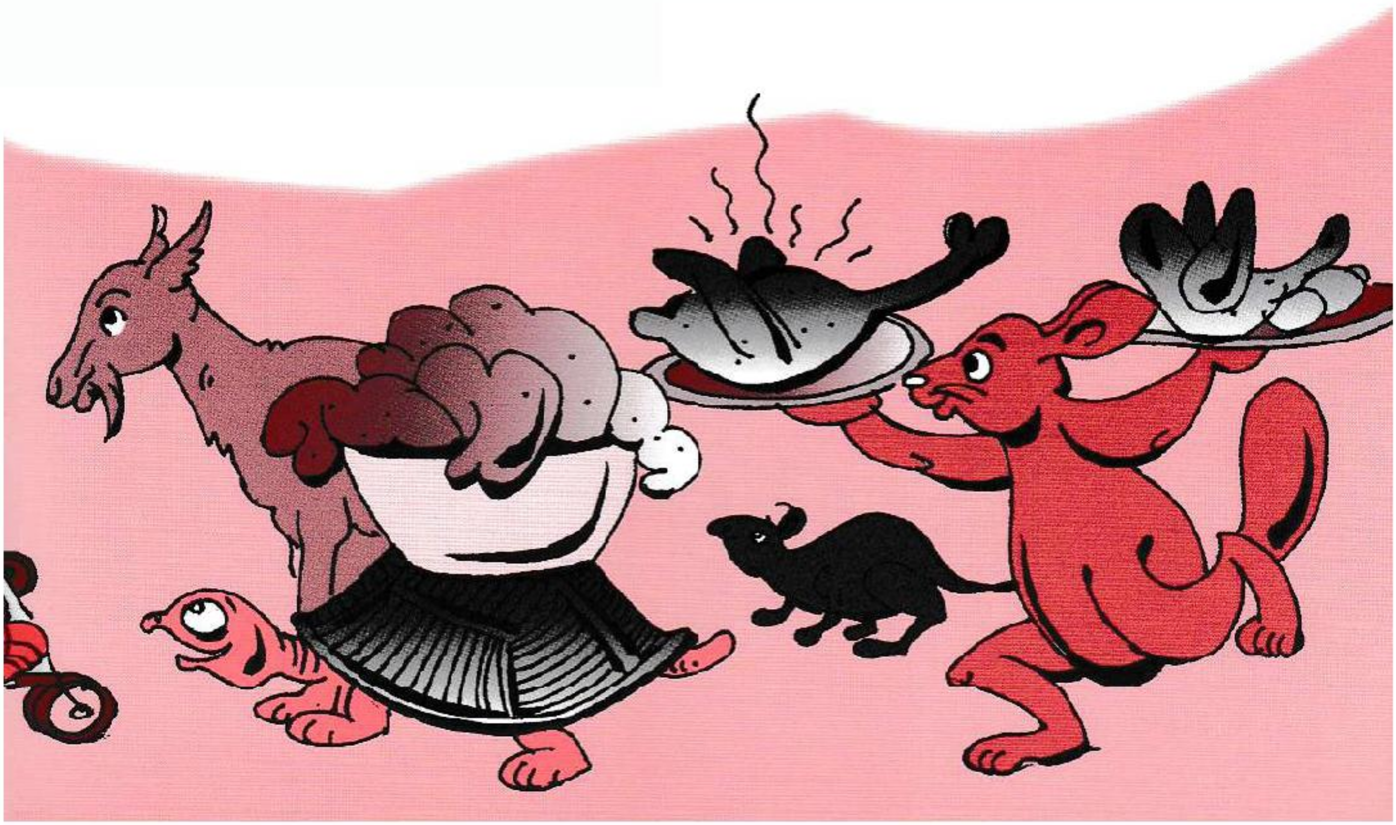
তবে অনেক প্রাণীই সিংহটির প্রতি বিশ্বস্ত রইল। আর সিংহটিও তাদের দেখার জন্য সর্বদা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে অরণ্যের খবরাখবর শুনত এবং প্রাণীরা তার কাছে যেসব সমস্যা নিয়ে আসত, সেগুলোর সমাধান করে দিত। সে তার সাধ্যমতো যে ভাবে পারত তাদের সাহায্য করত।

একদিন অরণ্যটি ভীষণ নিস্তব্ধ মনে হলো। সিংহটি সেখানে একেবারে একা বসে ছিল। কিছুক্ষণ পর সে অন্য প্রাণীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সে তার হুইলচেয়ারে চড়ে ধীরে ধীরে অরণ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

অচিরেই সে প্রাণীদের দেখা পেল। তারা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিল। এ কী! তারা সেখানে একটি সভা বা বৈঠক করছিল। সিংহটি গভীর মনোযোগ দিয়ে তাদের আলোচনা শুনতে লাগল।

একটি প্রাণী বলল, "আমাদের এখন একজন নতুন নেতা নির্বাচন করার সময় এসে গেছে!" "না, না!" অন্য একজন বলল।

"সিংহ সব সময়ই আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেয়," কেউ একজন বলল।



"কিন্তু ওর শরীরে তো আর আগের মতো শক্তি নেই!" অন্য একজন বলে উঠল। "ও কীভাবে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে?"

তখন বয়োজ্যেষ্ঠ পশুদের একজন বলল, "সিংহের শরীর হয়তো দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু ওর মন এখনো শক্তিশালী । দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুবাদে ও বনের অলিগলি আর রীতিনীতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানে। তাই কঠিন সময়েও ও আমাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে।"

পশুরা কিছুক্ষণ ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবল। তারপর তারা সবাই মিলে সিংহকেই তাদের নেতা হিসেবে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

সিংহ খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের আলোচনা শুনছিল। এবার সে তার গুহায় ফিরে গেল। সে তার হুইলচেয়ারে অত্যন্ত শান্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেউ একজন একটি সমস্যা নিয়ে তার কাছে এল। সিংহ চটজলদি সেটির সমাধান করে দিল। এরপর দুটি খরগোশের মধ্যকার একটি বিবাদের কথা উঠল। সেটিরও খুব সহজেই সমাধান হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই অন্য কেউ একজন তার জন্য খাবার নিয়ে এল।

দিনটি আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল। আর বনে আবার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরে এল।

বিদ্যা সাগর (চেন্নাই)-এর শিশুদের অভিনীত একটি নাটকের অবলম্বনে রচিত।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

66

পদ্মটির রাগ কেন

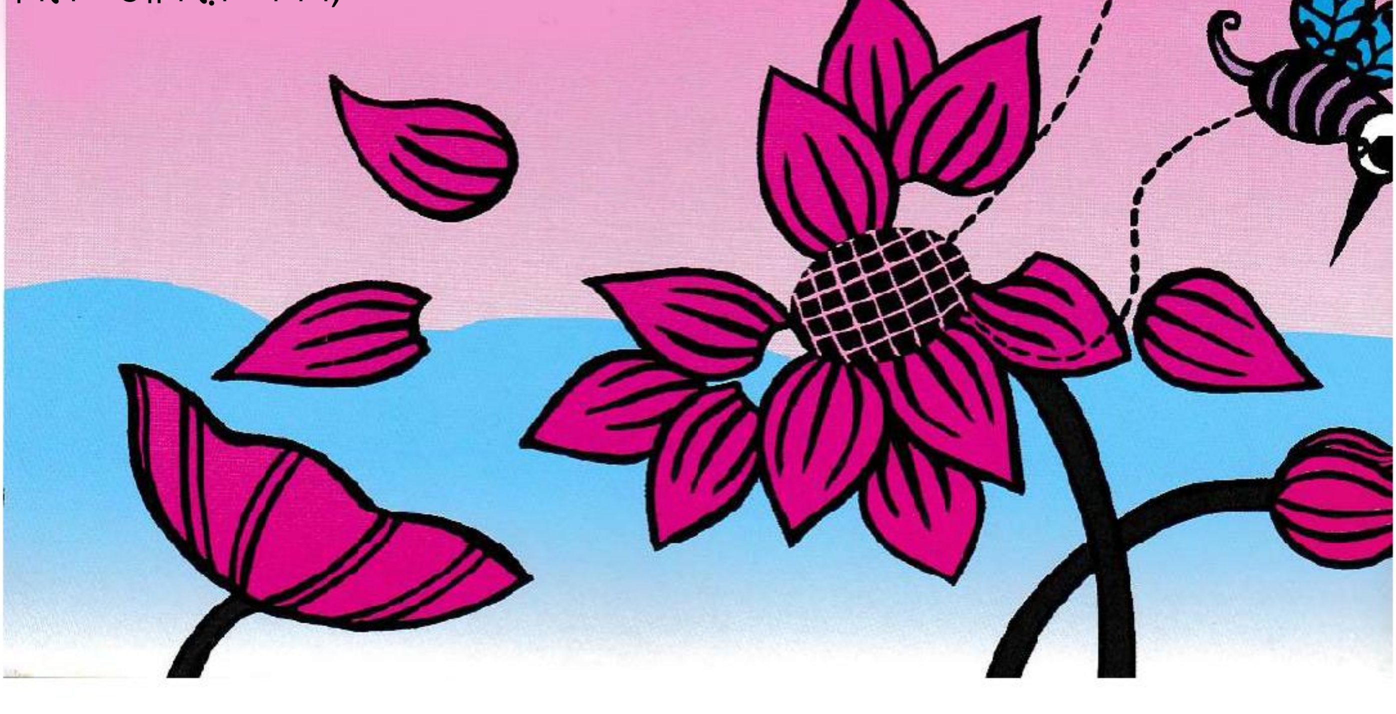
"সব মৌমাছিরা কোথায় যায়? আজ আমি ওদের পিছু নেব আর খুঁজে বের করব!" কৌতূহলে গুঞ্জন করতে করতে একটি ছোট্ট মৌমাছি মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

শীঘ্রই ছোট্ট মৌমাছিটি একটি পদ্মপুকুরের কাছে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে একটি সুন্দর পদ্মফুল দেখতে পেল। সে নিচে উড়ে এল এবং 'ঝপাং' করে ফুলের ওপর বসল। পদ্মটি কেঁপে উঠল। ফুলটি থেকে একটি পাপড়ি খসে পড়ল। এতে পদ্মটি রেগে গেল। "তোমার জন্য কোনো মধু নেই!" সে বলল। "দূর হও এখান থেকে!"



"পদ্মটি আমার ওপর কেন রেগে আছে?" ছোট্ট মৌমাছিটি ভাবল। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে উড়ে পালাল।

ছোট্ট মৌমাছিটি একটি গাছের ডালে এসে বসল। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিকমিক করছিল। মৌমাছিটি সূর্যের কিরণের দিকে তাকিয়ে বলল,





"ওই সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মটি
আমাকে কোনো মধু দেবে না।
ওগো উজ্জ্বল ও সুন্দর সূর্যকিরণ,
তুমি কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?“



সূর্যকিরণগুলো বলল, "চিন্তা কোরো না! আমরা পদ্মটির ওপর আলো ছড়াব আর ওকে খুশি করে দেব।" সোনালি কিরণগুলো পদ্মফুলটির ওপর নেমে এল। রোদ পোহানোর জন্য ফুলটি তার পাপড়িগুলো মেলে ধরল।

কিন্তু সে ছোট্ট মৌমাছিটিকে একটুও মধু দিল না!



কী দারুণ হতাশা! ছোট্ট মৌমাছিটি কিছুক্ষণ পদ্মটির চারপাশে ঘোরাঘুরি করল। তারপর মনমরা হয়ে সেখান থেকে উড়ে গেল।

এবার পুকুরের ওপর মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। ছোট্ট মৌমাছিটি বাতাসের স্পর্শ অনুভব করল এবং বলল,

"ওই সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মটি
আমাকে কোনো মধু দেবে না।
ওগো সুন্দর, স্নিগ্ধ বাতাস,
তুমি কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"

বাতাস উত্তর দিল, "চিন্তা কোরো না! আমরা পদ্মটির ওপর আলতো করে বইব আর ওকে সতেজ ও শীতল করে দেব।"

তারা ফুলটির ওপর দিয়ে আলতোভাবে বয়ে গেল। পদ্মটি আনন্দে তার পাপড়িগুলো দুলিয়ে দিল। কিন্তু সে ছোট্ট মৌমাছিটিকে একটুও মধু দিল না!

আহা, বেচারা ছোট্ট মৌমাছি! "পদ্মটির রাগ মেটাতে আমি কী করতে পারি?" সে ভাবতে লাগল। ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে কিছু মেঘ ভেসে এল।



মৌমাছিটি মেঘের ছায়া দেখতে পেল এবং আকাশের দিকে তাকাল। সে বলল,



"ওই সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মটি
আমাকে কোনো মধু দেবে না।
ওগো ঘনঘোর ও সুন্দর মেঘমালা,
তোমরা কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"

"চিন্তা কোরো না," মেঘেরা বলল। "আমরা পদ্মটির ওপর বৃষ্টি ঝরাব আর ওকে সুন্দর করে স্নান করিয়ে দেব।" পুকুরের ওপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরে পড়ল। সব গাছপালা আনন্দে মেতে উঠল এবং সতেজ হয়ে উঠল। পদ্মফুলটিও বৃষ্টির ফোঁটায় স্নান করল এবং সে-ও বেশ সতেজ অনুভব করল।

কিন্তু সে সেই ছোট্ট মৌমাছিটিকে একফোঁটাও মধু দিল না!

ছোট্ট মৌমাছিটি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল! সে বিষণ্ণ মনে, নিচু স্বরে গুঞ্জন করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেল, গাছের ডালে বসে একটি পেঁচা ঢুলছে।

সে পেঁচাটিকে বলল—
"ওই যে সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মফুলটি,
সে আমাকে একটুও মধু দেবে না।
ওগো জ্ঞানী ও সুন্দর পেঁচা,
তুমি কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"

পেঁচাটি ছোট্ট মৌমাছিটিকে বলল, "আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলব।" ছোট্ট মৌমাছিটি উড়ে পেঁচাটির কাছে চলে এল। পেঁচাটি ছোট্ট মৌমাছিটির কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। পেঁচাটি কী বলেছিল, তা আর কেউ শুনতে পেল না—যদিও তারা শোনার জন্য কম চেষ্টা করেনি!

এবার ছোট্ট মৌমাছিটি মনে আশা নিয়ে আবার পুকুরের দিকে উড়ে চলল। অত্যন্ত আলতোভাবে গিয়ে সে পদ্মফুলটির ওপর বসল। খুব সুন্দর ও বিনয়ের সাথে সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমাকে একটু মধু দেবে?"

হঠাৎ করেই পদ্মফুলটির মন থেকে সব রাগ দূর হয়ে গেল। সে ছোট্ট মৌমাছিটিকে সাদরে বরণ করে নিল। "তোমার যতটা ইচ্ছে, ততটাই নিয়ে নাও!" সে বলল।

ছোট্ট মৌমাছিটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোপন রহস্যটি শিখে ফেলেছিল!



একটি ভারতীয় লোককথা; শোভিতা পুঞ্জা-র পুনর্কথন অবলম্বনে।

P. Saraswati | V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi | S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

67 গান্ধী দাদু

সেটা ছিল ২রা অক্টোবর—গান্ধীজির জন্মদিন। আমার ছোট ভাই আর আমি তাঁকে "শুভ জন্মদিন" জানাতে এবং মালা পরাতে গিয়েছিলাম।

আশ্রমটি লোকে লোকারণ্য ছিল। সবাই খাদি সুতির পোশাক পরেছিলেন। এমনকি খাদির তৈরি টুপিও ছিল অনেকের মাথায়!

আমরা গান্ধীজির কাছে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে মালা পরিয়ে দিলাম। গান্ধীজি মৃদু হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পরের বার কি তোমরা আমার জন্য একটা খুব ভালো উপহার নিয়ে আসবে?"

"আপনি কী উপহার চান? আমাদের বলুন, দাদু! "



তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্য এমন একটি মালা নিয়ে এসো, যার সুতো তোমরা নিজেদের হাতে কেটেছ। আনবে তো?"

আমার ছোট ভাই বলল, "কিন্তু আমরা তো চরকায় সুতো কাটতে জানি না!" গান্ধীজি উত্তর দিলেন, "তোমাদের মা-বাবাকে বলো তোমাদের শিখিয়ে দিতে।"

বাড়ি ফেরার পথে আমার ছোট ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করল, " গান্ধী দাদু কেন চান যে আমরা সুতো কাটা শিখি?"

আমি আমার সাধ্যমতো গান্ধীজির ভাবনাটি তাকে বুঝিয়ে বললাম। "খাদি কাপড় বুনে গ্রামের মানুষ তাদের পরিবারের ভরণপোষণ জোগাড় করার একটা উপায় পায়। আমরা যদি বিদেশ থেকে কাপড় কিনি, তবে তাদের কাজের সুযোগ কমে যাবে। ঠিক এই কারণেই গান্ধী দাদু চান যে আমরা নিজেরা সুতো কাটি এবং খাদির পোশাক পরি।"



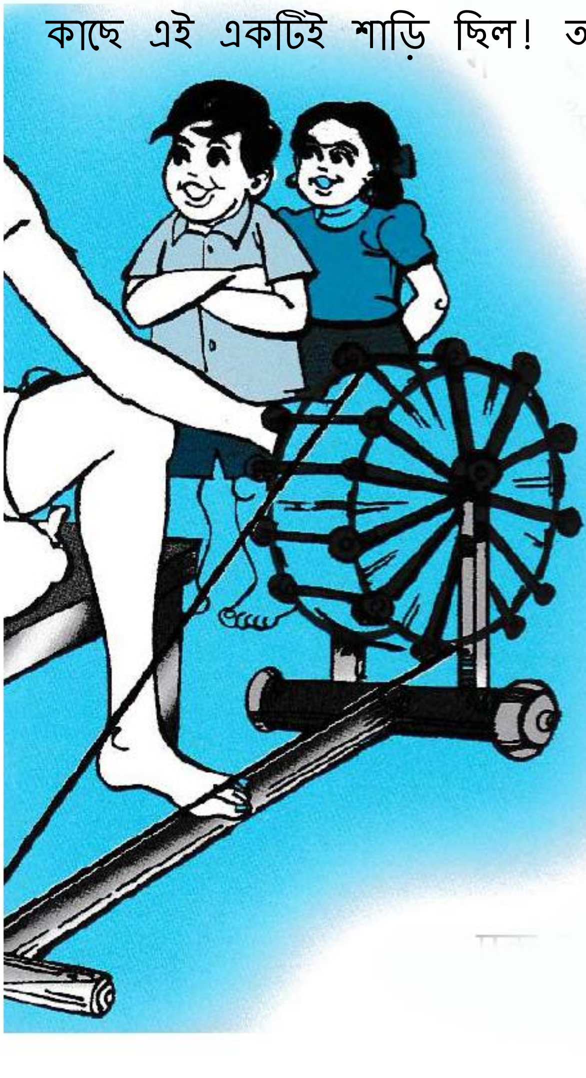
বাড়ি ফিরে আমরা মাকে আমাদের আশ্রমে যাওয়ার কথা জানালাম। মা গান্ধীজি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের আরও কিছু কথা বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন, "গান্ধীজি ব্রিটিশ শাসনের থেকে আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন। এই সংগ্রামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো খাদি।"

ঠিক সেই দিন থেকেই আমরা চরকা ব্যবহার করা শুরু করলাম।

গান্ধীজি প্রায়ই ট্রেনে করে যাতায়াত করতেন। তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একবার তিনি ট্রেনে করে মাদুরাই গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বহু মানুষের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদের খাদি ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানালেন। তাঁদের উত্তর শুনে তিনি বেশ ব্যথিত হলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা এতটাই গরিব যে খাদি কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই। এর দাম বড্ড বেশি।"

মাদুরাইয়ে গান্ধীজি অনেক কৃষককে মাঠে কাজ করতে দেখলেন, যাঁদের পরনে ছিল কেবল একটি করে কৌপীন বা ছোট কাপড়। তাঁদের এই চরম দারিদ্র্য দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন।

একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে এক মহিলা ও তাঁর সন্তান উপস্থিত ছিলেন। মহিলাটি তাঁর শাড়ির অর্ধেক অংশ নদীতে ডুবিয়ে ধুচ্ছিলেন, আর বাকি অর্ধেক অংশ নিজের শরীরের চারপাশে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তার কাছে এই একটিই শাড়ি ছিল! আর সেটাও ছিল ছেঁড়া!



ওই নারীর দারিদ্র্য গান্ধীজিকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তিনি নিজের গায়ের শালটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। তিনি নিজের কাছে থাকা সমস্ত পোশাকের কথা ভাবলেন।

"দেশে এত এত দরিদ্র মানুষ থাকতে, আমি কীভাবে নানা রকমের জামা পরতে পারি? এটা ঠিক নয়।"

তার মনের ভেতর তখন এক প্রবল আলোড়ন চলছিল। ১৯২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর, তিনি তার চিরাচরিত পোশাক ত্যাগ করলেন এবং কেবল একটি সাধারণ সাদা ধুতি পরতে শুরু করলেন।

একবার একটি ছোট ছেলে সাবরমতি আশ্রমে গান্ধীজির সাথে দেখা করতে এল। সে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, তুমি জামা পরোনি কেন? আমি কি আমার মাকে বলব তোমার জন্য একটা জামা সেলাই করে দিতে?"

গান্ধীজি মৃদু হাসলেন এবং উত্তর দিলেন, "তোমার মা আমার জন্য কটা জামা সেলাই করে দিতে পারবে?"

"তুমিই বলো দাদু, তোমার কটা জামা চাই। আমি মাকে বলব তোমার জন্য সেগুলো বানিয়ে দিতে।"

গান্ধীজি বললেন, "আমার ৪০ কোটি ভাই-বোন রয়েছে। তারা যখন জামাহীন অবস্থায় আছে, তখন আমি কীভাবে জামা পরতে পারি?"— স্নেহভরে তিনি এই প্রশ্নটি করলেন।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

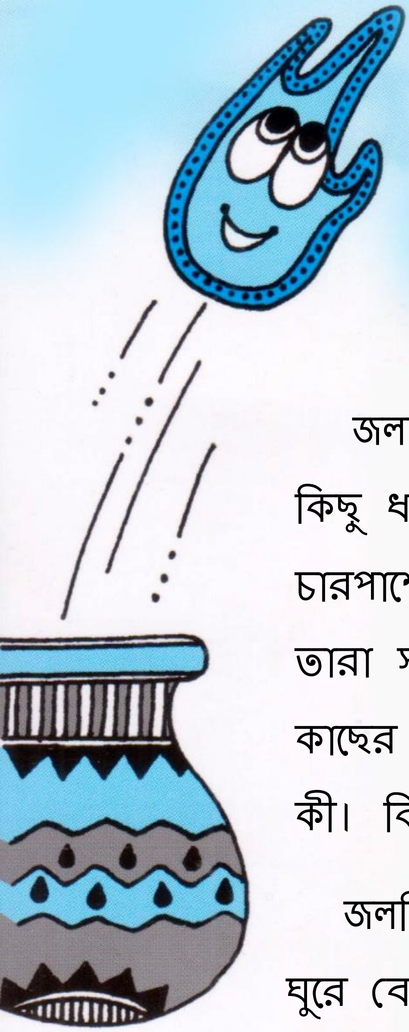
Artist Uma Krishnaswamy

জলবিন্দুর যাত্রা



একদা রোদের মধ্যে একটি মাটির পাত্র রাখা ছিল। পাত্রটির ভেতর কানায় কানায় জল পূর্ণ ছিল। জলের উপরিভাগে একটি জলবিন্দু ভেসে উঠল।

জলবিন্দুটি সূর্যের কিরণ অনুভব করল। আলোর দিকে উপরে ওঠার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। পাত্রের কিনারা ধরে নিজেকে ঠেলে ও টেনে উপরে তুলতে তুলতে, একসময় সে পাত্রের মুখ ছাড়িয়ে উপরে উঠে এল!

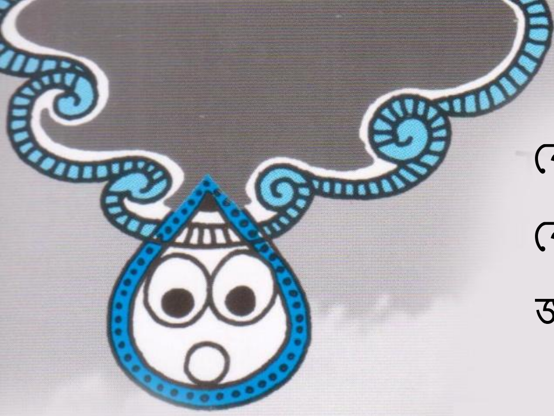


মাত্র এক মুহূর্তের জন্য জলবিন্দুটি ভয় পেল। তারপরই সে সূর্যের দিকে তাকাল! আনন্দে বিভোর হয়ে সে জলীয় বাষ্প রূপে আকাশের পানে উঠে গেল।

জলবিন্দুটি বাষ্প হয়ে উপরের দিকে ভেসে চলল এবং তারপর কিছু ধবধবে সাদা মেঘের মাঝে ঘনীভূত হয়ে জমাট বাঁধল। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল—আরও অনেক জলবিন্দু সেখানে রয়েছে। তারা সবাই একইভাবে আকাশে উঠে এসেছিল। সে তার সবচেয়ে কাছের জলবিন্দুগুলোকে জিজ্ঞেস করল, সূর্যের কাছে পৌঁছানোর উপায় কী। কিন্তু কেউই তা জানত না।

জলবিন্দুটি বেশ কয়েক দিন ধরে মেঘেদের মাঝে ঘুরে বেড়াল। সে এখানে-সেখানে ভেসে বেড়াল। একদিন সে দেখল, একটি নতুন মেঘ এগিয়ে আসছে। এই মেঘটি সাদা বা ধবধবে তুলোর মতো ছিল না। এটি ছিল বিশাল, ভারী এবং কালো রঙের। জলবিন্দুটি লাফ দিয়ে সেই নতুন মেঘটির ভেতরে চলে গেল।

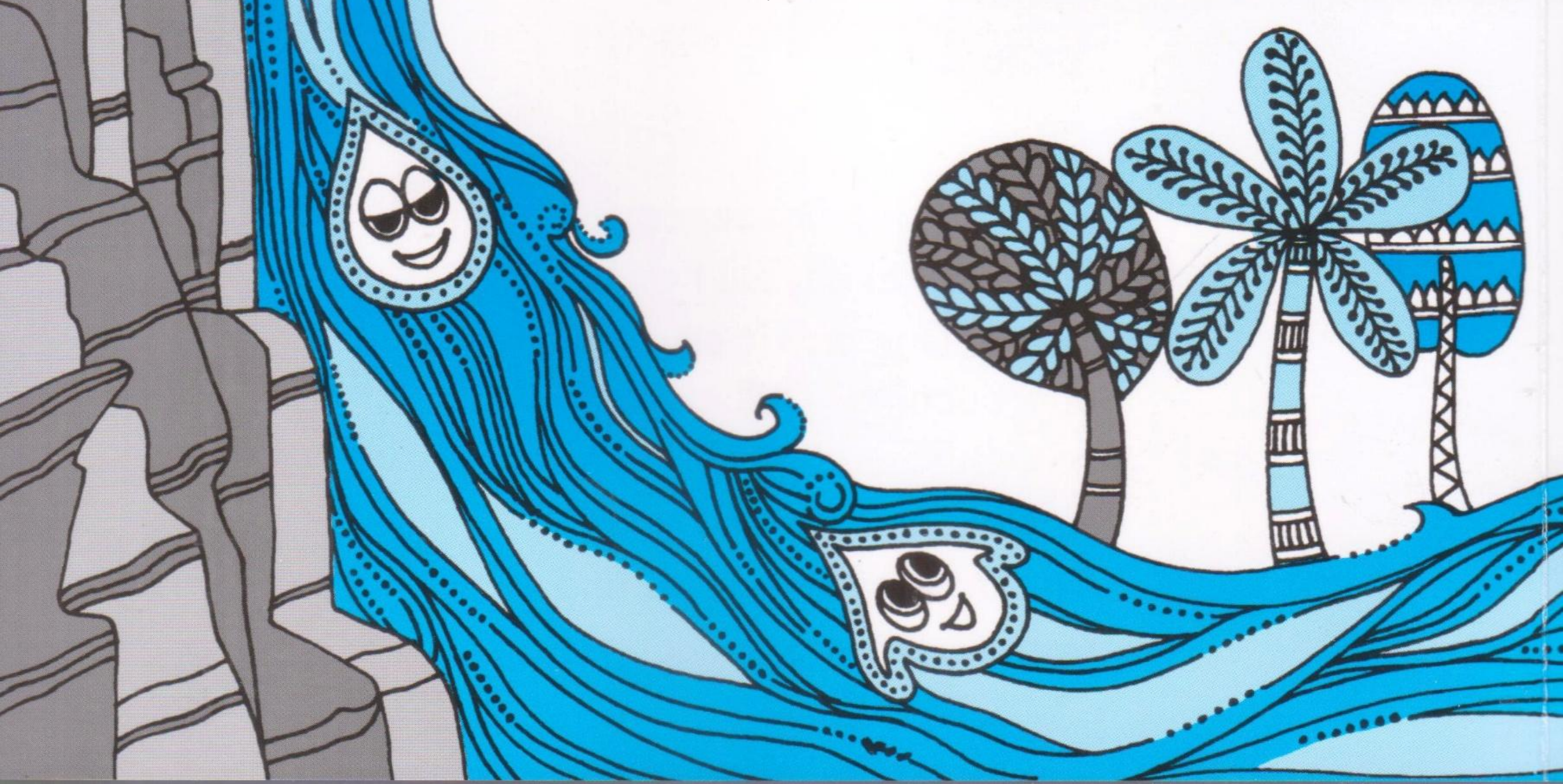




সে রাতে কালো মেঘটি খুব অস্থির হয়ে উঠল। সে কেবলই মোচড়াতে লাগল। বজ্রপাতের গর্জনে সে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জলবিন্দুটি বুঝতে পারল যে, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

হঠাৎ বেড়ে ওঠা এক দমকা বাতাস জলবিন্দুটিকে মেঘের ভেতর থেকে বাইরে উড়িয়ে দিল। সে তখন অঝোর ধারায় ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাদের ভিড়ে মিশে গেল । বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে গেল! বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছলাৎ শব্দে একটি খরস্রোতা নদীর জলে গিয়ে পড়ল।

জলবিন্দুটি অনুভব করল—নদীর জল কখনো উপরে উঠছে, আবার কখনো নিচে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎই সে পাহাড়ের এক কিনারা থেকে নিচে ছিটকে পড়ল! নদীর ধারাটি পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে চলল। বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে সে তীব্র গতিতে ছুটে চলল। জলের সাদা ফেনা ছিটকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল! এরপর, নদীটি শান্ত ও ধীরলয়ে নিজের পথে চলতে শুরু করল।



জলবিন্দুটি তার আশেপাশের অন্যান্য জলবিন্দুদের জিজ্ঞেস করল—নদীটি কোন দিকে এগিয়ে চলেছে। "এটি সেই বিশাল নদীর সাথে মিলিত হতে ছুটে চলেছে," তারা বলল।

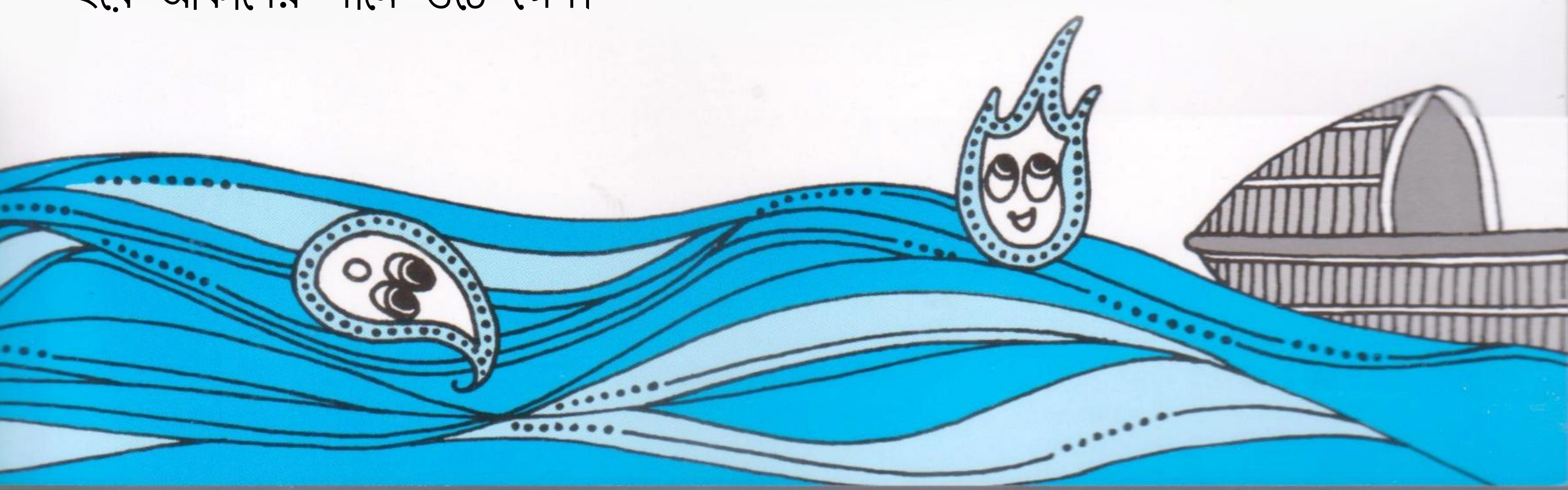
আর ঠিক সেখানেই ছিল সেই বিশাল নদীটি। নদীটি ছিল প্রশস্ত ও কানায় কানায় পূর্ণ। নদীর দুই তীর জুড়ে ঝুঁকে ছিল সারি সারি গাছ। ছায়া-ঢাকা পরিবেশের মাঝেও সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল নদীর জলকণাগুলো।

জলকণাটি পরম আনন্দে সেই দৃশ্য দেখল। জলের সেই দ্রুত প্রবাহ ও গতি সে মন ভরে উপভোগ করল। আহা, কী দারুণভাবেই না সে তার এই যাত্রা উপভোগ করছিল! তবে সে এ-ও জানত যে, তার এই যাত্রা খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

এরপর নদীটি গিয়ে মিশল সাগরে। সাগরের বিশাল জলরাশি সেই ক্ষুদ্র জলকণাটিকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিল।

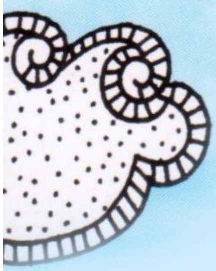
তরঙ্গমালার নিচ থেকে জলকণাটি আকাশের দিকে তাকাল। আহা! সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছিল পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘেরা। জলকণাটির মনে পড়ে গেল—কীভাবে সে একটি মাটির পাত্র থেকে উঠে এসে সেই সাদা মেঘেদের দলে শামিল হয়েছিল। এবার সে সূর্যের দিকে তাকাল।

হঠাৎই জলকণাটি বুঝতে পারল—তাকে এখন কী করতে হবে। সে কোনোমতে নড়াচড়া করতে করতে জলের উপরিভাগে উঠে এল। সর্বশক্তি দিয়ে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করতেই সে উষ্ণ সূর্যের আলোর স্পর্শ পেল। আবার সে জলীয় বাষ্প হয়ে আকাশের পানে উঠে গেল।





এবার সে একদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। আর যখন রাত নেমে এল, তখন সে তারাদের স্নিগ্ধ আলোয় নিজেকে ডুবিয়ে দিল।



একদিন জলকণাটি নিচের দিকে—পৃথিবীর পানে তাকাল। সে দেখতে পেল সেই বিশাল সাগরকে, যেখান থেকে সে উঠে এসেছিল। সে দেখতে পেল সেই নদীটিকে এবং সেই খরস্রোতা ঝর্ণাটিকেও। তার যাত্রাপথে সে যা-কিছু পেছনে ফেলে এসেছিল—সবকিছুই এখন তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল।

ছোট ছোট মেঘের দল এসে জলকণাটির চারপাশে জড়ো হতে শুরু করল। জলকণাটি নিজেকে আরও ওপরের দিকে টেনে নিল এবং সেই মেঘেদেরও ছাড়িয়ে আকাশের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গেল।

এরপর সে ধীরে ধীরে কুয়াশায় পরিণত হয়ে গেল। সেই কুয়াশা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং পারিপার্শ্বিক বাতাসের সাথে একাকার হয়ে মিশে গেল।

ক্রিস্টোফার ই. জোন্স-এর "One Drop of Water" অবলম্বনে রচিত

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

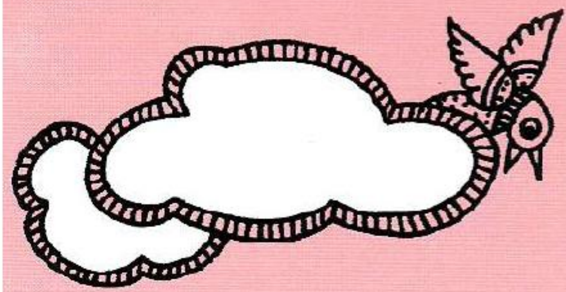
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

যে শিশুটি সূর্যের সাথে খেলা করত



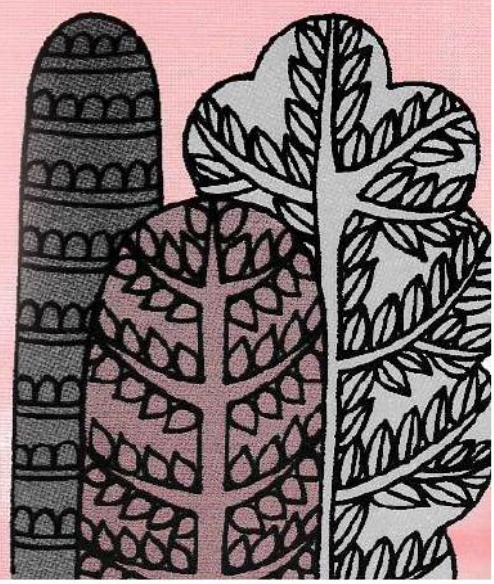






হনুমান যখন ছোট ছিল, তখন সে ছিল এক অত্যন্ত দুরন্ত বানর-শিশু। সে যেকোনো কিছুকেই খেলাতে পরিণত করত! তার মা অঞ্জনা তাকে সামলাতেই পারতেন না।

একবার হনুমান লক্ষ্য করল যে, সূর্যের একটি রশ্মি তার মুখের ওপর এসে পড়েছে। সে আকাশের দিকে তাকাল। ওই তো সূর্য! দেখতে ঠিক যেন একটি বিশাল লাল ফল। সেটাকে ধরার জন্য সে লাফ দিল- উপরে, আরও উপরে, আরও উপরে। "আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব!" সে বলে উঠল।



সূর্য এতে মোটেও খুশি হলো না। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু হনুমান সারা আকাশ জুড়ে তার পিছু ধাওয়া করল। দিন গড়িয়ে রাত হল, আর রাত পেরিয়ে আবার দিন এল। সেই ধাওয়া করতেই থাকল। হনুমানের কাছে এ এক কী চমৎকার খেলা!

সূর্য বুঝতে পারল যে তার সাহায্যের প্রয়োজন। সে ইন্দ্রকে ডাকল । ইন্দ্র যখন দেখলেন কী ঘটছে, তখন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন । তিনি বজ্রের আঘাতে হনুমানকে ধরাশায়ী করলেন! হনুমানের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সে নিচের দিকে পড়তে শুরু করল।

হনুমানের দিব্য পিতা, পবনদেব (বায়ু), তাকে মাঝ-আকাশেই লুফে নিলেন। "তুমি কীভাবে এমন একটি ছোট শিশুকে আঘাত করতে পারলে?" তিনি ইন্দ্রের ওপর গর্জে উঠলেন।

পবনদেব—যিনি সমস্ত বাতাসের চেয়ে বেশি দ্রুতগামী—এবার গভীর শ্বাস নিলেন এবং পৃথিবী থেকে সমস্ত বাতাস শুষে নিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে সাইক্লোন, হারিকেন এবং টর্নেডো বয়ে গেল। এমনকি বিশাল পর্বতমালাও টলমল করতে শুরু করল! সমস্ত মানুষ ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা আতঙ্কে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

তখন পবনদেব বললেন: "আমার পুত্রের দেহে শ্বাস ফিরিয়ে দাও, তার বিনিময়ে আমি পৃথিবীতে বাতাস ফিরিয়ে দেব।"



তিনি হনুমানকে মাটির অনেক গভীরে নিয়ে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বাতাস পুরোপুরি থেমে গিয়েছিল। গাছপালা, ফুল, ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, মানুষ এবং পশুপ্রাণী—সমস্ত জীবজন্তু—একটু বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগল।

শীঘ্রই চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল; কোথাও কোনো শব্দ রইল না। বাতাস ছাড়া পৃথিবী যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল।

দেবতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। "দয়া করে ইন্দ্রকে ক্ষমা করুন," তাঁরা মিনতি করলেন এবং হনুমানের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করলেন।

তাঁরা হনুমানকে নিরাপদ রাখার জন্য কিছু বিশেষ উপহারও দিলেন:

"বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না!"

"তুমি যেখানে খুশি, সেখানেই উড়ে যেতে পারবে!""

তুমি নিজের ইচ্ছেমতো তোমার আকৃতি ও আকার পরিবর্তন করতে পারবে!"

এভাবেই দেবতারা হনুমানকে বিশেষ শক্তিসমূহ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।





কিন্তু পবনদেব এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। "আমার পুত্র কি এই বিশেষ শক্তিগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা জানতে পারবে? বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ছাড়া এই শক্তিগুলো তো একেবারেই অকেজো," তিনি দেবতাদের বললেন।

"চিন্তা করবেন না!" দেবতারা অভয় দিলেন। "হনুমান তাঁর দৈহিক শক্তির পাশাপাশি তাঁর প্রজ্ঞার জন্যও সুপ্রসিদ্ধ হবেন!"

অবশেষে বায়ু নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। সমগ্র পৃথিবীতে মানুষ, পশু ও গাছপালা —সবকিছুতেই প্রাণ ফিরে এল।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

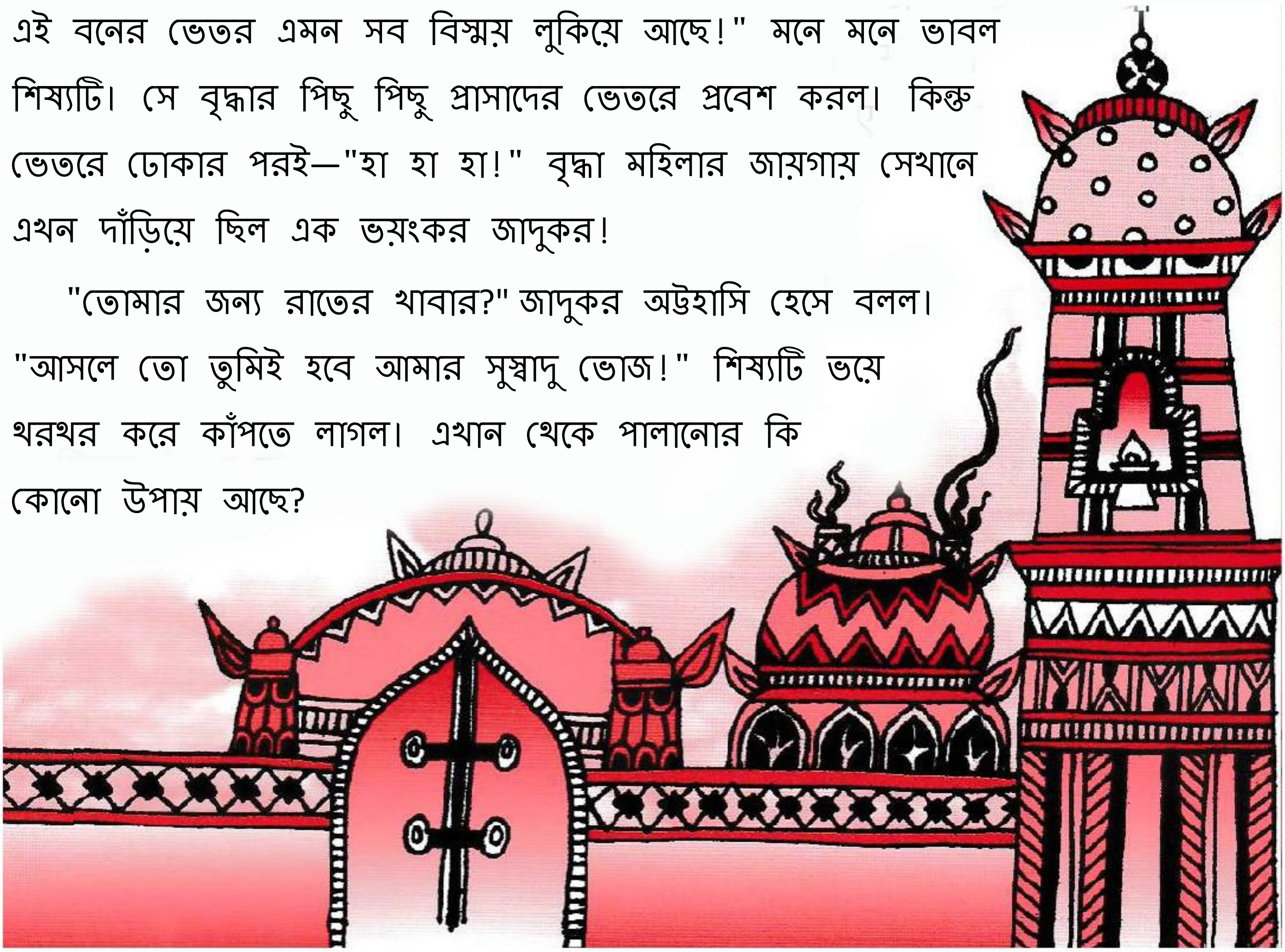
তিনটি পালক

একদিন এক ঋষি তাঁর শিষ্যকে বললেন, "আজ তোমাকে বনে গিয়ে ঔষধি লতাপাতা সংগ্রহ করতে হবে। তোমার সাথে এই তিনটি পালক নিয়ে যাও। এগুলো তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।" এই বলে তিনি শিষ্যকে তিনটি পালক দিলেন।

শিষ্য বনের ভেতর ঘুরে ঘুরে ঔষধি লতাপাতা সংগ্রহ করতে লাগল। কয়েক ঘন্টা পর সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হঠাৎ একটি কন্ঠস্বর তাকে ডেকে উঠল, "খোকা! আমার সাথে বাড়ি চলো। আমি তোমাকে চমৎকার রাতের খাবার রেঁধে খাওয়াব, তারপর তুমি যত খুশি বিশ্রাম নিতে পারবে।" কন্ঠস্বরটি ছিল এক বৃদ্ধা মহিলার। তিনি শিষ্যটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন।

সেই বৃদ্ধা শিষ্যটিকে পথ দেখিয়ে এক বিশাল প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। প্রাসাদের চূড়াগুলো আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। "আমি তো জানতামই না যে এই বনের ভেতর এমন সব বিস্ময় লুকিয়ে আছে!" মনে মনে ভাবল শিষ্যটি। সে বৃদ্ধার পিছু পিছু প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পরই—"হা হা হা!" বৃদ্ধা মহিলার জায়গায় সেখানে এখন দাঁড়িয়ে ছিল এক ভয়ংকর জাদুকর!

"তোমার জন্য রাতের খাবার?" জাদুকর অট্টহাসি হেসে বলল। "আসলে তো তুমিই হবে আমার সুস্বাদু ভোজ!" শিষ্যটি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। এখান থেকে পালানোর কি কোনো উপায় আছে?



ঠিক তখনই তার সেই তিনটি পালকের কথা মনে পড়ল। সে একটি ফন্দি আঁটল। সে জাদুকরকে বলল, "আমাকে এখনই খেয়ে ফেলবেন না; দেখুন আমি কত নোংরা হয়ে আছি। আগে আমাকে স্নান করতে দিন। স্নান সেরে আমি যখন আপনার কাছে ফিরে আসব, তখন আমি হবো একদম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর সুগন্ধি!"



স্নানঘরে ঢুকে শিষ্যটি একটি পালক মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল, "যখনই জাদুকর আমাকে ডাকবে, তুমি আমার হয়ে উত্তর দিও।" তারপর সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ল এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে পালাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই জাদুকর শিষ্যকে ডেকে তাড়া দিল। ভেতর থেকে উত্তর এল, "এই তো আমি চলে আসছি!" কিন্তু স্নানঘর থেকে শিষ্য আর বেরিয়ে এল না!

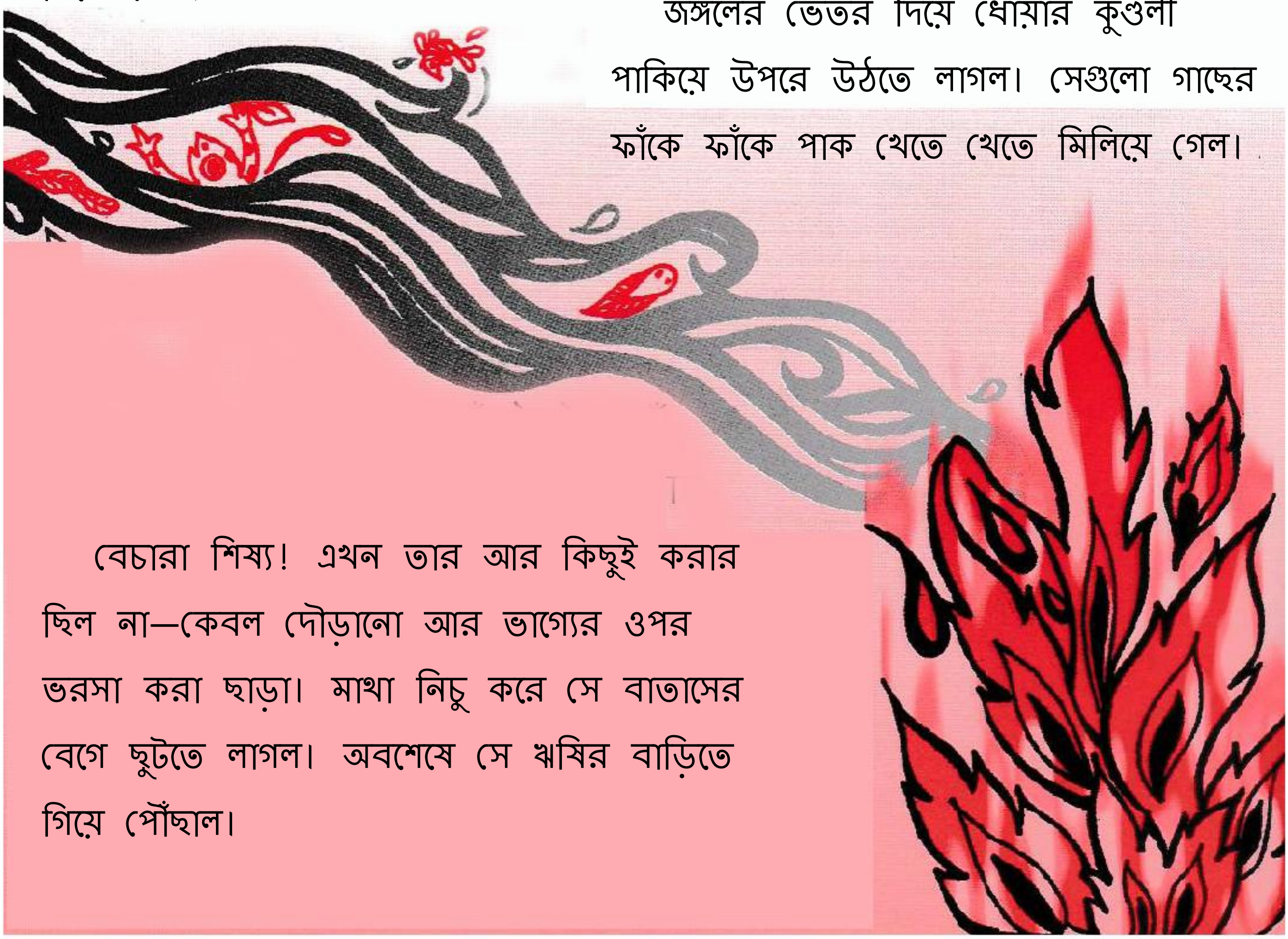
জাদুকর যখন আবার ডাকল, তখনো ভেতর থেকে সেই একই উত্তর এল। কিন্তু এবারও শিষ্যটি বেরিয়ে এল না! ক্ষুধার্ত জাদুকরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল; সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছিল না। নিজের জাদুকরী শক্তিবলে সে স্নানঘরের দরজা ভেঙে ফেলল। কিন্তু ঘরটি ছিল একদম খালি! জাদুকর ক্রোধে কাঁপতে লাগল। সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমি তোকে ধরবই!"

শিষ্যটি শুনতে পেল যে জাদুকর তার পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি আরেকটি পালক হাতে তুলে নিয়ে বলল, "আমার আর জাদুকরের মাঝখানে একটি নদী তৈরি করে দাও!" মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে একটি নদী বয়ে চলল। সেই জাদুকরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম তৈরি হল ! শিষ্যটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। " উফ, আমি বেঁচে গেছি!" সে মনে মনে ভাবল।

কিন্তু ঠিক তখনই, "গলগল" করে জলের শব্দ ভেসে এল। পেছনে ফিরে শিষ্যটি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখল! জাদুকর তার মুখটা বিশাল করে হাঁ করে আছে। সে নদীর জল পুরোটাই পান করে ফেলছে! জল কলকল শব্দে তার মুখের ভেতর ছুটে ঢুকছে।

শিষ্যটি তৃতীয় পালকটি হাতে তুলে নিল। "আমার ঠিক পেছনে একটি দাবানল সৃষ্টি করো," সে আদেশ দিল। দাউ দাউ করে এক বিশাল আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু আবার জাদুকর তার মুখটা বিশাল করে হাঁ করল। শোঁওও! সে যে জল গিলে খেয়েছিল, তার সবটুকু প্রবল বেগে বেরিয়ে এল। এক দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দের সাথে সাথে আগুন নিভে গেল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল। সেগুলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল।



বেচারা শিষ্য! এখন তার আর কিছুই করার ছিল না—কেবল দৌড়ানো আর ভাগ্যের ওপর ভরসা করা ছাড়া। মাথা নিচু করে সে বাতাসের বেগে ছুটতে লাগল। অবশেষে সে ঋষির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল।

জাদুকর ছিল ঠিক তার পেছনেই। সে বাড়ির প্রবেশপথে এসে থামল এবং ঋষিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আপনার শিষ্যকে আমার হাতে তুলে দেবেন? নাকি তার বদলে আমি আপনাকেই খেয়ে ফেলব?"

"নিজের ক্ষমতা নিয়ে এত নিশ্চিত হবেন না!" ঋষি উত্তর দিলেন। "আমি মন্ত্রের লড়াইয়ে আপনার সাথে সমানে পাল্লা দিতে পারি! চলুন, আমাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হোক। আপনি যদি জেতেন, তবে আমার শিষ্যকে নিয়ে যেতে পারেন।"

"বেশ। তবে শুরু করা যাক," জাদুকর বলল।

"আপনি কি নিজেকে এই বাড়িটির সমান উঁচু করতে পারবেন?" ঋষি জিজ্ঞেস করলেন। মুহূর্তের মধ্যেই জাদুকর সেই বাড়িটির সমান উঁচু হয়ে গেল। কিন্তু ঋষি তাতে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হলেন না। "লম্বা তো যে-কেউই হতে পারে," তিনি বললেন। "আচ্ছা, এখন বলুন তো—আপনি কি নিজেকে একটা মটরদানার সমান ছোট করতে পারবেন?"

"এ আবার কঠিন কী?" জাদুকর জিজ্ঞেস করল। চোখের পলকে সে নিজেকে একটা মটরদানায় রূপান্তরিত করে ফেলল। ঋষি সেই মটরদানাটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের ভেতর পুরে দিলেন। এক জোরালো ঢোক গিলে তিনি সেটি গিলে খেয়ে ফেললেন।

আর এভাবেই সেই দুষ্ট জাদুকরের চিরসমাপ্তি ঘটল!

একটি জাপানি লোককথা অবলম্বনে রচিত



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy